‘নির্বোধ আচরণ আছে প্রভূত পরিমাণে’

দোল। ফাগুন। ফাগুয়া। শিম্গা। শিগমো। উক্কুলি। মঞ্জলকুলি। এ সবই হোলির নানান নাম। নানান রূপও। কিন্তু অন্তরে অন্তরে এক উল্লাস, এক মুক্তির বহুবর্ণ প্রকাশ। হোলি এমনকী পশ্চিম দুনিয়ারও মন কেড়েছে।

জহর সরকার

৫ মার্চ , ২০১৫, ০০:০১:০০

রফতানিযোগ্য। হোলিকা দহন। সিঙ্গাপুর, ২০১৩। ছবি: গেটি ইমেজেস।

ভারতবাসী সারা বছর ধরে যত উত্সব করে, তার মধ্যে হোলির সঙ্গে শাস্ত্রের সম্পর্ক সবচেয়ে কম আর বেলাগাম হুল্লোড় সবচেয়ে বেশি। ফাল্গুনের পূর্ণিমা তিথিতে এই উত্স, সাধারণত আগের রাত্রে হোলিকা দহন দিয়ে এর সূচনা হয়, তার পর সারা দিন অসহায় মানুষজনের উপর আবির এবং রঙের বর্ষণ চলে, শেষ হয় মিষ্টি এবং অন্য নানা খাদ্য ও পানীয়ের উল্লাসে। পণ্ডিত এস এম নটেশ শাস্ত্রীর বক্তব্য: ‘এর সঙ্গে কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের কিছুমাত্র যোগ নেই, তবে নির্বোধ আচরণ আছে প্রভূত পরিমাণে। ’

হোলি, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? উত্তর খুঁজতে হলে কয়েক শতাব্দী পিছিয়ে যেতে হবে, সন্ধান করতে হবে নানান লোককথা এবং লোকাচারের গহনে। নির্দিষ্ট

ঐতিহাসিক নথি বা তথ্য খুঁজে কোনও লাভ নেই, ভারতের প্রধান ধর্মটির কাছে সে-সব অতি বিরক্তিকর। সপ্তম শতাব্দীতে রচিত দণ্ডিন্-এর সংস্কৃত নাটক দশকুমারচরিত ও শ্রীহর্ষের রত্নাবলী'তে হোলির কথা আছে। পুরাণেও এই উত্সবের কথা ইতস্তত পাওয়া যায়। মুঘল মিনিয়েচারেও এ নিয়ে নানান কাহিনি চিত্রিত হয়েছে। অক্সফোর্ড ডিকশনারি সপ্তদশ শতাব্দী থেকে হোলি নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে: ১৬৮৭ সালে অক্সফোর্ড লিখেছে Houly, ১৬৯৮ সালে Hoolee, ১৭৯৮-এ Huli, ১৮০৯-এ Hoh-lee, ইত্যাদি।

গল্প এবং আচার নানা জায়গায় ও নানা যুগে নানা রকম, কিন্তু বহু শতাব্দীব্যাপী ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের দাপটে উত্সবের সময় এবং মূল চরিত্রে দেখা গেছে আশ্চর্য 'ঐক্য'। নাম অবশ্য বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম: বাংলা, ওডিশা ও অসমে দোলযাত্রা, বিহারে ফাগুন, মহারাষ্ট্রে শিম্গা, গোয়া ও কোঙ্কন উপকূলে শিগমো। আবার কোঙ্কনের দক্ষিণাঞ্চলে এই উত্সব উক্কুলি নামে পরিচিত, মালয়ালম ভাষায় এর নাম মঞ্জলকুলি, যার অর্থ হল হলুদ-স্নান। কর্নাটক ও তেলঙ্গানার মানুষের বিশ্বাস, পবিত্র অগ্নিতে যাঁকে দাহ করা হয় তিনি হোলিকা নন, তিনি হলেন কামদেব, আর তাই ওঁরা বলেন কাম-দহন। পঞ্জাবে এ সময় ঘরবাড়িতে নতুন রং করা হয়, মেয়েরা কাপড়ের উপর অপূর্ব সব হাতের কাজ করেন, বহুবর্ণ সেই শিল্পকর্মের নাম চক-পুরানা। তামিলনাড়ুতে উত্সবের নাম হয়ে যায় পান্গুণি-উথিরম্, এবং অনেক প্রাক্-হিন্দু দেবতা এই দিন বিবাহবার্ষিকী পালন করেন; বুঝতে অসুবিধে হয় না, এ হল তাঁদের হিন্দু দেবলোকে আত্মসাত্ করার প্রকল্প। এখানে কোনও হোলিকা দহন হয় না, কারণ হোলি এখানে প্রধানত বসন্ত উত্সব, তবে অবশ্যই তাতে ধর্মের ভাগটা অন্যান্য রাজ্যের চেয়ে বেশি। গুজরাতে হোলি চলে দু'দিন ধরে। হোলিকার আগুনে নারকেল এবং ভুট্টা আহুতি দেওয়া হয়। এই সময় রবিশস্য পেকে ওঠে, ফলে খাওয়াদাওয়া, নাচ, গানের ধুমধাম অনেক বেশি। কমবয়সি ছেলেমেয়েরা ননী-ভাণ্ডের দখল নিয়ে 'লড়াই' চালায়, সে উচ্ছ্বাসে প্রতিফলিত হয় বসন্ত, যৌবন, স্বাধীনতা। আসল হোলি অবশ্যই কৃষ্ণ-কানহাইয়ার মথুরা ও বৃন্দাবনে, তবে এখানেও বারসানার 'লাঠ-মার হোলি' নিয়েই সবচেয়ে মাতামাতি। মেয়েরা সত্যিই পুরুষদের লাঠিপেটা করে, ছেলেরা দৃশ্যত সেই আদরের মার খেয়ে গান গায়, মেয়েদের রাগিয়ে দেওয়ার গান, তারা কপট রাগে আরও মারতে থাকে।

গঙ্গার তীর ধরে আরও নেমে এলে দেখা যাবে, কানপুরে হোলি উদ্‌যাপিত হয় জাতীয়তাবাদী গঙ্গা মেলা হিসেবে, আবার বারাণসীতে কাদামাটি গায়ে মেখে কুস্তি না হলে চলে না। আরও নীচে বিহারে ফাগুয়ার প্রচলন, এটা মূলত ভোজপুরী উত্‌সব, সেখানে রঙের বদলে কাদার ব্যবহার অতি প্রশস্ত। তার পর দুধ এবং মশলা সহ ভাঙের সরবত, অর্থাত্‌ ঠান্ডাই, এবং ঢোলক বাজিয়ে নাচগান। আবার উত্তরে কুমায়ুন পাহাড়ে পনেরো দিন আগে থেকে স্থানীয় মানুষ মিলে হোলিকার কাঠামো তৈরি করে, তার নাম চীর বন্ধন। তার পর আসে হোলি-ধুলান্দি-র মাহেন্দ্রক্ষণ। ওডিশা ও বাংলায় দোলপূর্ণিমায় ঝুলনদোলায় রাধাকৃষ্ণের মিলন উদ্‌যাপিত হয়। বলা হয়, এই তিথিতেই শ্রীচৈতন্য তাঁর ভক্ত ও তীর্থযাত্রীদের মাধ্যমে পুরী থেকে বাংলায় দোল-উত্‌সব রফতানি করেছিলেন। হরিভক্তিবিলাস ও সমকালীন অন্যান্য লেখায় এই দোল-উত্‌সবের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু শ্রীচৈতন্যের জীবনীতে বা বৈষ্ণবপদাবলীতে নবদ্বীপে দোল উদ্‌যাপনের কোনও বিবরণ পাওয়া যায় না। ভগিনী নিবেদিতা বাংলার দোলযাত্রা নিয়ে একটি মর্মস্পর্শী লেখা লিখেছিলেন, ১৯১৩ সালে তাঁর মৃত্যুর পরে যেটি লন্ডনে প্রকাশিত হয়। তিনি দোলপূর্ণিমাকে শ্রীচৈতন্যের জন্মদিন হিসেবে চিহ্নিত করে বলেছেন, এটি ‘প্রাক্‌-হিন্দু মানুষের প্রাচীন উত্‌সব’। হোলির সঙ্গে দানবী হোলিকার সংযোগ নিয়ে আর একটু বলা দরকার। দৈত্য প্রহ্লাদের গল্পে হোলিকার খুবই গুরুত্ব আছে। হোলিকা হিরণ্যকশিপুর বোন, প্রহ্লাদের পিসি। তার পোশাক ছিল ‘ফায়ারপ্রুফ’। শিশু প্রহ্লাদকে কোলে নিয়ে হোলিকা আগুনে প্রবেশ করেছিল, কারণ সে জানত সে পুড়বে না, কিন্তু ভাইপো দগ্ধ হয়ে যাবে। হল অবশ্য উল্টো— তার পোশাকের মাহাত্ম্য অন্তর্হিত হল, আর নারায়ণের করুণায় তাঁর ভক্ত প্রহ্লাদ অক্ষত দেহে আগুন থেকে বেরিয়ে এল। প্রসঙ্গত, হোলিকা বাচ্চাদের খেয়ে ফেলে, শিশুমাংস তার ভারী প্রিয়। পণ্ডিতরা হোলিকা দহনকে প্রতীক রূপে দেখেন। রোগজীবাণুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয়ের প্রতীক। বছরের এই সময়টাতেই তো যত রকমের রোগের জীবাণু ছড়িয়ে পড়ে এবং তার প্রধান বলি হয় ছোট শিশুরা। অন্য গল্পটা কামদেবকে নিয়ে। শিবের রোষানলে তিনি দগ্ধ হয়েছিলেন। সেই দাহও হয়তো বা প্রতীকী— উদ্দাম হোলিখেলার মধ্যে কামনাবাসনার বিস্ফোরণ ঘটতে পারে, সেটা দমন করার জন্যই আগুনের কল্পনা; যদিও, সত্যি বলতে কী, ঠান্ডা জলেও কাজ হত। মধ্যযুগ থেকে শুরু করে ইউরোপীয় পর্যটকরা পর্যন্ত বাইরের লোকেরা হোলির একটা

ব্যাপার নজর করেছেন, সেটা হল অশ্লীল গান গাওয়ার প্রথা। নানা হিন্দু গ্রন্থেও এ নিয়ে স্পষ্ট ভাবে লেখা হয়েছে। ১৮৮০'র দশকে উইলিয়ম ক্রুক কিংবা একশো বছর আগে এম এম আন্ডারহিল এই অশালীন ভাষার কথা উল্লেখ করেছেন। বস্তুত, বিভিন্ন প্রাচীন স্মৃতি'তে বলা হয়েছে, এই উত্সব শ্রীচৈতন্যের কয়েক শতাব্দী আগেও প্রচলিত ছিল, তাতে নিম্নবর্ণের মানুষ ভয়ানক অশ্লীল সব কথাবার্তা বলত। এর থেকে দুটো ব্যাপার বোঝা যায়: এক, এই উত্সবে নিহিত যৌন ইঙ্গিত এবং দুই, এর প্রাগার্য ইতিহাস। আন্ডারহিল লিখেছেন, 'নিম্নবর্গের পুরুষ ও বালকদের নাচ এই উত্সবের একটা বৈশিষ্ট্য'। একই সঙ্গে তিনি লক্ষ করেছেন যে, হোলি সব বর্ণের মানুষকে একসঙ্গে আনত। তিনি প্রাচীন শাস্ত্রবচনের সাক্ষ্য দিয়ে লিখেছিলেন, 'হোলির দ্বিতীয় দিনে নিম্নবর্ণের মানুষের দেহ স্পর্শ করে তার পর স্নান করলে সমস্ত অসুখ দূর হয়ে যায়।' এটা কি আসলে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা, মানে ইমিউনিটি গড়ে তোলা?
ভারত ও নেপাল ছাড়িয়ে হোলি চলে গিয়েছিল সুদূর সুরিনাম এবং ত্রিনিদাদ-টোবাগোর মতো দেশে, সেখানে এর নাম ফাগুয়া। গায়ানাতে তো এটা রীতিমত জাতীয় উত্সব, জাতি বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত মানুষ এতে যোগ দেন। ফিজি ও মরিশাসের ভারতীয় বংশোদ্ভূত মানুষরা আজও, দেশ ছেড়ে বহু দূরে চলে যাওয়ার এত কাল পরেও ঢোলক বাজিয়ে নাচের তালে 'ফাগ গাইন' গাইবেনই।
রং ছুড়ে হোলি খেলার ভারতীয় প্রথাটি এ কালে ইউরোপ আমেরিকারও মন কেড়েছে। পশ্চিম দুনিয়ায় বেশ কিছু কমিউনিটি উত্সবে, এমনকী বাণিজ্যিক অনুষ্ঠানেও হাজার হাজার সাহেব-মেম রং খেলার উত্সাহে ভারতবাসীকেও হারিয়ে দেন। আমেরিকার সিবিএস বা এনবিসি'র মতো টেলিভিশন চ্যানেলে জনপ্রিয় রিয়ালিটি শো'য় হোলি স্থান করে নিয়েছে। বিভিন্ন সংগীতস্রষ্টা বা ব্যান্ড হোলির তীব্র আনন্দকে নিজেদের সৃষ্টিতে আত্তীকরণ করে নিয়েছেন, যেমন দক্ষিণ আফ্রিকায় গুডলাক কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেশা অথবা রেজিনা স্পেকটর-এর 'ফিডেলিটি'। আসলে আনন্দ, রং, খুশির নাচগান, এ সবই আজও মানুষের মন ভোলায়। আর সেই কারণেই ভারতের সাংস্কৃতিক রফতানির আরও একটি জিনিস যুক্ত হয়েছে। হরি বোল!